আশায় বসতি ঃ অন্নদা প্রসাদ

জাকারিয়া স্বপন

একটা ভূমিকা ছাড়া লেখাটি শুরু করতে পারছি না।

গত অক্টোবরে নির্বাচনের পরপরেই বাংলাদেশের কিছু অংশে সংখ্যালঘু নাগরীকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। সংখ্যালঘুরা কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী সেটা আমি ইচ্ছে করেই বলছি না, কারন মানুষকে আমি ধর্ম দিয়ে বেধে ফেলি না। আমরা যত বেশি ধর্ম নিয়ে কথা বলবো এবং কাদা ছুড়বো, ততবেশি ধর্ম আমাদের জীবনে পাথর হয়ে বসে যাবে, আর মানবতা ততই হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকবে। মানুষকে আমি মানুষ হিসেবেই দেখতে পছন্দ করি। কারো কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে থাকলে সেটা তার একান্তই ব্যক্তিগত বিশ্বাস। সেটা নিয়ে যুক্তিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার যত বন্ধু আছে কখনও ভেবে দেখার ফুসরৎ হয়নি কে মুসলমান, কে হিন্দু আর কে বৌদ্ধ।

যাইহোক বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। প্রবাস থেকেও অনেকে অনেক লেখালেখি করেছেন। এতদিন আমি চুপচাপ ছিলাম। এটার পক্ষে বা বিপক্ষে একটি বর্নও লিখিনি। তবে অনেক মানুষের লেখা আমরা প্রকাশ করেছি। এবার নিজেই লিখতে বসেছি। কেন এতো দিন লিখিনি, মূল ঘটনাটি লেখার আগে সেটাই একটু বলার চেষ্টা করছি।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, বিদেশে বসে দেশের কোনও জটিল বা সরল সমস্যা নিয়ে লেখালেখি করবো না। তার প্রধান কারন হলো, সমস্যার বাইরে থেকে নিরাপদ স্থানে বসে একটি সমস্যার সমালোচনা করাটা খুবই সহজ একটি কাজ এবং সেটা অনেকটা হিপোক্রেসির পর্যায়ে পড়ে। কোনও সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হলে বা সমস্যাটির সমাধান করতে হলে, সেই সমস্যার ভেতরে থেকেই সেটা করা উচিত। বা সরজমিনে গিয়ে দেখে তারপর কথা বলা উচিত। পত্রিকা পড়ে সেটা বিশ্বাস করে কলম চালানোটা ঠিক যথার্থ নয় বলেই আমার মনে হয়েছে। দীর্ঘদিন দেশে পত্রিকার সাথে জড়িত থেকে আমি তাদের রিপোর্টিং সম্পর্কে যথেষ্ঠ আস্থা রাখতে পারছি না। এটা হতে পারে আমার সংকীর্ণতা। তবে, যা আমি ভালো করে জানি না বা নিশ্চিত নই সেটা নিয়ে লিখতে আমি চাই না। তাই ইদানিং পত্রিকায় লেখা ছেড়ে দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্পের বই লেখার চেষ্টা করছি। প্রতিবেদন বা সমালোচনা লিখতে গেলে সেটা সম্পর্কে একশভাগ নিশ্চিত হয়েই লেখা উচিত, অনুমানের উপর ভর করে নয়, যা বাংলাদেশের প্রায় সকল কলাম লেখকরাই করে থাকেন।

বিদেশে বসে দেশের সমস্যা নিয়ে লেখার আরেকটি খারাপ দিক হলো, কোনও ইস্যুতে অতিরিক্ত আবেগ চলে আসতে পারে, যা হয়তো স্বাভাবিকভাবে দেশে থাকলে আসতো না। সেক্ষত্রে লেখাটি একপক্ষীয় হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। আমরা যারা বিদেশে থাকি, তারা দেশের নেতিবাচক কোনও ঘটনায় সাধারনের চেয়ে অনেক বেশি রিএ্যাক্ট করি। তার একমাত্র কারন হলো, আমরা নিজেরা একটি নিরাপদ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা যদি আফগানিস্তানে থাকতাম, তহালে হয়তো বাংলাদেশের সমস্যাগুলো খুবই ঠুনকো মনে হতো। এটা অনেকটা রিলেটিভ ব্যাপার। যেমন কিছু উদাহরন দেয়া যাক।

দেশে থাকাকালীন সময়ে এমন কোনও হরতালে আমি অফিসে যাইনি সেটা মনে পড়ে না। মিরপুর থেকে হেটে হেটে বা রিক্সায় করে ধানমন্ডি চলে গিয়েছি। এবং চলতে পথে শুনেছি যে, এখানে ওখানে বোমা হামলায় মানুষ মেরে ফেলেছে। এমনকি নিজের চোখে সামনেও বোমায় মানুষের শরীর উড়ে যেতে দেখেছি। মানুষ মারা যায়নি এমন হরতাল হয়তো খুব কম হয়েছে। একদিকে মানুষ মারা যাচ্ছে, আরেক দিকে মানুষ জীবনের তাগিদে ছুটে চলেছে। সেই ছুটে চলা মানুষের কাছে বোমায় মারা যাওয়া জীবনের মূল্য খুবই কম। কারন দেশে এর চেয়েও আরো অনেক বেশি সমস্যা বিরাজ করছে নিত্যদিন। এবং সে কারনেই আমরা দেশে ফিরে যেতে চাইনা, সেই সমস্যায় নিজেকে জড়াতে চাই না। ইদানিং পত্রিকার পাতায় বোমায় নিহত মানুষের ছবি দেখলে আতকে উঠি। একশ একবার গালি দিয়ে বলি, দেশটা তো নরক হয়ে যাচ্ছে। ভীষন দুঃচিন্তা নিয়ে বাংলাদেশে ফোন করি। ওপাশ থেকে মানুষ জন এমনভাবে কথা বলে, যেন কিছুই হয়নি। তাদের ভাবখানা এমন যে, “এটা নিয়ে এতো বিচলিত হবার কি আছে? এটা তো নিত্য দিনের ঘটনা।”

একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যখন এই নির্যাতনের খবর বিভিন্ন পত্রিকাগুলো ছাপতে শুরু করে, তখন ইংল্যান্ড থেকে এক সাংবাদিক বন্ধুর ই-মেল পড়ে সারা রাত আমি ঘুমাতে পারলাম না। তার কষ্ট যেন আমার বুকে এসে চেপে বসেছে। কষ্টটা এতই প্রকট হলো যে, তাকে দু’কলম লিখে শান্তনা দেবার মতো অবস্থা আমার নিজেরই থাকলো না। তার মা-বোন যখন বিপদের মুখে, তখন তার পাশে দাড়াবার মতো মহৎ কাজ তো আর হতে পারে না। কিন্তু আমার নিজের অবস্থাই অচল হয়ে পড়লো। আমি দুটো জিনিস কোনও ভাবেই সহ্য করতে পারি না। এক শিশুদের কান্না, আরেকটি হলো কোনও নারীর উপর অত্যাচার। এই দুটো বিষয়কে খুব পাশবিক

মনে হয়। আমার মাথায় রক্ত তুলে দেয়। নিজের ভেতর প্রতিহিংসা জাগিয়ে তুলে। ইচ্ছে করে, আশেপাশের সব কিছু ভেঙ্গেচুরে ফেলি।

তাই অতি কষ্টে অতিরিক্ত কিছু লিখে ফেলি এই ভয়ে এতোদিন কলম ধরিনি। এবং সেই অতিরিক্ত ভাবাবেগ আবার শত সহস্র প্রবাসী মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হলে সেটা আরো ভয়ংকর। তাই অতি সংযমের সাথে আমি প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চাই। এটা নিয়ে লিখতে গেলে আমি অতিরিক্ত ভাবাবেগে জড়িয়ে পড়বো। যাদের জন্য লিখতে বসেছি সেটা গুড়েবালি হয়ে যাবে। তাই এবারে আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

গেলো রবিবার সিলিকনভ্যালীর "স্পন্দন-বি" এবং "দৃষ্টিপাত" মিলে ক্ষতিগ্রস্থ সেই পরিবারগুলোর জন্য অর্থ তোলার ব্যবস্থা করেছিল। বিষয়টি নিয়ে যেহেতু নানান মনে নানান মতবাদ আছে, সেকারনে বেছে বেছে কিছু পরিবারকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। আমি ভালো সংগঠক নই এবং ব্যাক্তিগতভাবে কোনও সংগঠনের সাথে জড়িতও হতে চাই না, কারন তাতে মতপ্রকাশে সেই সংগঠনের মতবাদটি দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোনও ভালো কাজের সাথে নিজেকে সামান্য যুক্ত করতে পারলে ধন্য মনে করি। সে কারনে উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে একবাক্যেই রাজি হয়ে গেলাম। এবং যথারীতি সঠিক সময়ে অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হলাম।

অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখে প্রথমেই ঘাবড়ে গেলাম। সুন্দর পরিপাটি করে বাঙালী ষ্টাইলে হলঘরটি সাজানো হয়েছে। দেয়ালে বাংলাদেশের হাতে কাজ করা কারুকাজের কাপড়, বাহারী পোষ্টার, ফেষ্টুন। ষ্টেজের পেছনের দেয়ালে প্রজেকশনে একটি স্লাইড জ্বলছে। সেখানে কদম ফুল, পুকুরে শাপলা, লাল কৃষ্ণচূড়া শোভিত। তার নিচে লেখা - এদেশের নাম রেখেছি সোনার বাংলাদেশ। ষ্টেজের ঠিক পেছনেই বড় করে সুন্দর নকশা করা হাতে লেখা - "আশায় বসতি ঃ অন্নদা প্রসাদ"। হঠাৎ করে আমি আমার বর্তমান অবস্থান ভুলে গেলাম। মনে হলো, আমার সেই প্রিয় স্কুলের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার হলঘরে বসে আছি।

মাহমুদুল হাসান সাহেব একটি কবিতা দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করলেন। পেছনে তার সাথে বাজতে থাকলো তানপুরার সুর। কেন জানি মনে হলো ইস্তেকবালের কবিতা শুনছি। কবিতার রেশ শেষ না হতেই একদল নারী-পুরুষ গাইতে শুরু করলেন- আনন্দলোকে মঙ্গলালোকো বিরাজ সত্য সুন্দর। টেনে টেনে গাওয়া প্রতিটি সুরের তাল এসে পড়তে শুরু করে আমার বুকে। কতদিন শুনিনা গানটি। মনটা কেমন জানি পবিত্রতায় ভরে উঠলো। আমি হা করে তাকিয়ে থাকি পবিত্রতম মানুষগুলোর দিকে - যারা মঞ্চে গেয়ে চলেছেন আপন মনে গভীর হৃদয়ে।

এরপর এলো একটি দেশের গান - এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে; আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়; ও আমার দেশ, ও আমার প্রেম। ছোটবেলায় এই গানটি স্কুলে কত গেয়েছি। ইচ্ছে হলো চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ওদের সাথে গাইতে শুরু করি। লজ্জায় আর সেটা করা হলো না। নিজের জায়গায় বসেই আস্তে করে গাইতে শুরু করলাম, পাছে কেউ শুনে ফেলে।

জয়ীর মা শরীফা আপা আমার একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা কলেজে বাংলা পড়াতেন। তার মেয়ে ভালো আবৃত্তি করতো শুনেছিলাম, কিন্তু নিজ কানে কখনও শোনা হয়নি। ছোট্ট সেই মেয়েটি আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। সে যখন মাইকে আসাদ চৌধুরীর কবিতা "বারবারা" আবৃত্তি করতে শুরু করলো, আমার শরীরের সবগুলো লোম দাড়িয়ে গেলো। মানুষের কথা মানুষকে এমন পাগল করে দেয় কিভাবে? মানুষের আবেগ হৃদয় থেকে হৃদয়ে গ্রোথিত হয় কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নাই। কিন্ত আসাদ চৌধুরীর সেই কবিতা ঠিকই প্রতিধ্বনীত হলো হলঘরের দেয়ালে দেয়ালে। আমাকে কেমন জানি একটা মোহের মধ্যে ফেলে দিলো। এরপর যখন সবাই মিলে গাইলো "*আগুনের পরশমনি ছোয়াও প্রানে - এ জীবন পূর্ন করো - এ জীবন পূর্ণ করো*" নিজেকে খুবই অধম মনে হলো। তুচ্ছ মনে হলো এই জীবন। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো, এ জীবন কেনো তুমি এতো ক্ষুদ্র করে পাঠালে আমায়?

কিছু কিছু গান আছে প্রথমবারেই ভালো লেগে যায়। কিছু কিছু সুর আছে প্রথমবারেই ভেতরে গেথে যায়। "ঘুম ঘুম রাত যায়" গানটি হলো ঠিক তেমন একটি গান। ধর্ষিতা ইয়াসমীনকে নিয়ে শিল্পি মাহমুদুজ্জামান বাবুর লেখা গানটি আমি আগে কখনও শুনিনি। তিথির গলায় যখন প্রথম শুনলাম, তখনই বুঝলাম বাংলার কতো সুর এখনো অচেনা, কতো পথ এখনো হয়নি চলা। ও যখন দরদী গলায় গাইছিল, "*ঘুম ঘুম রাত যায়, ঘুম ঘুম দিন; ঘুম ঘুম দিন যায়, ঘুম ঘুম রাত*", তখন বারবার মনে হচ্ছিল, আসবে কবে সেই সোনালী প্রভাত।

এরপর মঞ্চে এলো পনেরোটি গোলাপ শিশু। তাদের গায়ে সাদা রঙের টি-শার্ট, বুকে আমেরিকার পতাকা, আর কালো ব্যাজ। তাদেরকে আমি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলাম। কারো কারো চোখের ভেতরে দৃষ্টি আমার। সেই চোখের চেয়ে পবিত্রতম আর কিছু নেই। অনুষ্ঠান শুরুর দিকে সবাইকে একটি করে মোমবাতি দিয়ে দেয়া হয়েছিল। এবার সেই মোমবাতিগুলো ধরানো হলো। মোমবাতির ধর্ম হলো, একটি দিয়ে হাজারটি ধরানো যায়, তাতে নিজের আলো কমে না। সবার হাতে হাজারটি ছোট মোমবাতি। অন্ধকার প্রায় ঘর। সেই রহস্যময় আলোয় মোমবাতি দুলিয়ে শিশুরা গাইতে শুরু করলো "উই আর দি ওয়ার্ল্ড, উই আর দি চিল্ড্রেন"। তাদের সাথে পুরো ঘর ভর্তি লোকজন সবাই মোমবাতি নাড়তে শুরু করলো। সেই ঘর আর সাধারন কোনও গানের আসর থাকলো না, মুহুর্তেই হয়ে উঠলো একটি আলোর জাহাজ। আমরা সেই জাহাজের যাত্রী, আমাদের শিশুরা তার কান্ডারী।

এমন একটি মায়াবী সময়ে মাহমুদুল হাসান সাহেব ধাক্কা দিয়ে সবাইকে কঠিন বাস্তবে নিয়ে এলেন। নির্বাচনোত্তর বাংলাদেশে প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের আগুণের করুন চিত্র তুলে ধরলেন তিনি, একের পর এক স্লাইড। পূর্নিমা রানী, শেফালী, মৃনালীর ধর্ষনের কথা, প্রিয় শিক্ষক মোহারীর হত্যা, ভারতে শরনার্থী, অন্নদা প্রসাদ গ্রামের পাশবিকতা। অন্তশত্ত্বা মা কংকনা থেকে ১০৮ বছরের বৃদ্ধ - কেউ রেহাই পায়নি হায়নার ছোবল থেকে। এই স্লাইডগুলোর পেছনে বাজছে ভূপেন হাজারিকার গান - "*মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না বন্ধু?*" কেনো যেনো আমার চোখে পানি চলে এলো; মাথায় রক্ত উঠতে শুরু করলো; চোখ বন্ধ করে বারবার নিজেকে বললাম, স্রষ্ট্রা আমাকে এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দাও। একসময় লজ্জায় মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলাম। মনের ভেতর বিশাল এক প্রশ্ন জেগে উঠলো, গুটি কয়েক ওই পশুর কাছে আমরা এতোগুলো মানুষ কি এতই অসহায়? কিছুই কি করার নেই আমাদের? মানুষ কি হেরে যাচ্ছে অমানুষের কাছে?

নাহ, সেটা তো হতে পারে না। মানবতার ইতিহাস তো সেটা বলে না। মানুষের ইতিহাস তো নিত্যদিন অসুরের সাথে যুদ্ধের ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস ভালোবাসার ইতিহাস। *স্পন্দন-বি* আর *দৃষ্টিপাত*-এর মানুষেরা সেই গুরু দায়িত্বই পালন করছেন। আমাদেরকে ভালোবাসতে শেখাচ্ছেন। তাদের নিত্যদিনের ব্যস্ততম জীবনের মাঝে বাড়তি এই সময় বের করে এমন সুন্দর একটি অনুষ্ঠান করা কেবলমাত্র তখুনি সম্ভব, যখন মানুষের প্রতি মানুষের তীব্র কমিটমেন্ট থাকে। তাদের সেই কমিটমেন্টের ডাকে সাধারন মানুষও সাড়া দিয়েছে। উদ্যোক্তরা চেয়েছিলেন ছয় হাজার ডলার। তারা তৎক্ষনাত পেয়েছেন প্রায় নয় হাজার ডলার। দুর্দিনের এই সময়ে এটা নেহায়ত মন্দ নয়। সেই টাকায় কিছু পরিবারের তো একটু মাথা গোজার ঠাই হতে পারে। তাদের কষ্টে একটু প্রলেপ হতে পারে। চোখের পানি মুছার একটি আচল তো হতে পারে!

একবার মনে হয়েছিল, তাদের সন্মানহানীর কি হবে?

পরক্ষনেই মনে হলো, এই লজ্জা তো তাদের নয়, এই লজ্জা হলো আমাদের। আমাদের তো তাদের পদতলে গিয়ে হাতজোর করে ভিক্ষা চাওয়া উচিৎ, "মাগো তোমার বঙ্গ সন্তানেরে ক্ষমা করো তুমি। এই পাপের হাত থেকে রেহাই দাও।"

সেই ক্ষমা হয়তো কখনই চাওয়া হবে না। কষ্ট নিয়ে বেচে থাকতে হবে বাকিটা জীবন।

পুনশ্চঃ আমেরিকাতে একটি বিশেষ দলকে দেখা যাচ্ছে, তারা এই বিশেষ ইস্যুটিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করেছেন। তারা আমেরিকার সরকারকে বাংলাদেশের জন্য সাহায্য বন্ধ করার জন্যও চিঠিপত্র লিখেছেন বলেও খবর বাজারে আছে। এই কাজে বাংলাদেশী নন এমন লোকদের জড়িত থাকার কথা বেশি শুনা যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশকে একটি তালেবান দেশ হিসেবে দেখাতে চাইছেন। এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর হতে পারে না। বাংলাদেশর সমস্যা সেই দেশের নাগরীকদের সমস্যা। সেই সমস্যায় বাইরের দেশের লোকদের জড়ানোটা মোটেও ভালো কথা নয়। এই বিষয়ে প্রবাসীদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের একটি জাতীয় চরিত্র হলো, বাইরের দেশে গিয়ে বিচার দেয়া। বাইরের দেশের মানুষকে দেবতা মানা এবং নিজের দেশের আভ্যন্তরিন সমস্যা নিয়ে সাহায্য চাওয়া। এর চেয়ে দীনতা আর কি হতে পারে। এই ধরনের লোকদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন উঠটা অমূলক নয়। আমাদেরকে এই ধরনের কার্যক্রমকে বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বর্তমান সময়টা একটু খারাপ, সেটা সবার মাথায় রাখা দরকার। তাই দয়া করে, নিজের দেশের সমস্যা নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করুন। সেটাই হবে সবচে গৌরবের।

১লা ফ্রেব্রুয়ারী ২০০২
স্যান্টাক্লারা, ক্যালিফোর্নিয়া
ই-মেলঃ zs@e-Mela.com